পার্থসারথি

PARTHASARATHI

গীতারত্ন শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ প্রবর্তিত ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী বাংলা মাসিক পত্রিকা

১০ই বৈশাখ, ১৪৩৩ / 24.04.2026

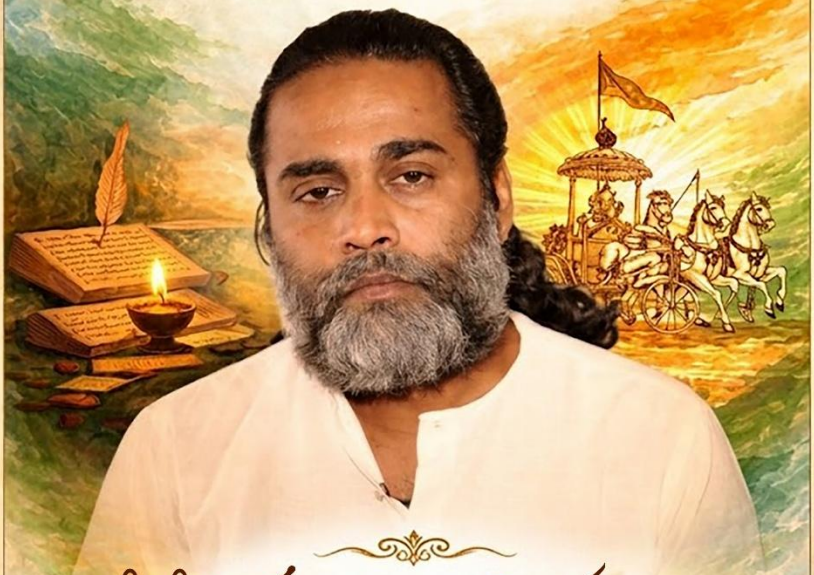

শ্রীপ্রীতিকুমার জন্মশতবর্ষ স্মরণে

৭৩ তম বিশেষ অন্তর্জাল সংখ্যা

Website: https://www.parthasarathipatrika.com

সম্পাদক - সুনন্দন ঘোষ

-: সূচীপত্র :-

গীতায় দিব্যজীবন লাভের উপায়	শ্রীপ্রীতি কুমার ঘোষ
চক্রেশ্বর শ্রীপ্রীতিকুমার	সংকলন
আত্মকথা	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
আমাদের সাধুজী	শ্রীমতী অদিতি পাল
শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ - আমার চিনিমামা	শ্রী পার্থ কুণ্ডু
অহৈতুকি	শ্রীমতী সমর্পিতা মৈত্র
কিছু নিজের কথা	শোভনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
‘বাবা’কে	শ্রী সুনন্দন ঘোষ
‘পার্থসারথি’র চিত্রাঙ্কন	শ্রীমতী প্রচেতা ঘোষ

[৬৬তম বর্ষ, ৭৩তম বিশেষ অন্তর্জাল সংখ্যা, রূপায়ন – সুনন্দন ঘোষ]

Founded by Sri Priti Kumar Ghosh in June, 1960, PARTHASARATHI Bengali Monthly Magazine, RNI 5158/ 60, published in print format for sixty years, thereafter converted to e-magazine by Sri Sunandan Ghosh, Editor & Publisher in April, 2020 during prolonged Nationwide Lockdown and to be published in the Website: https://www.parthasarathipatrika.com

Contact: 182 Jessore Road, Flat- D/1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 8910977590.

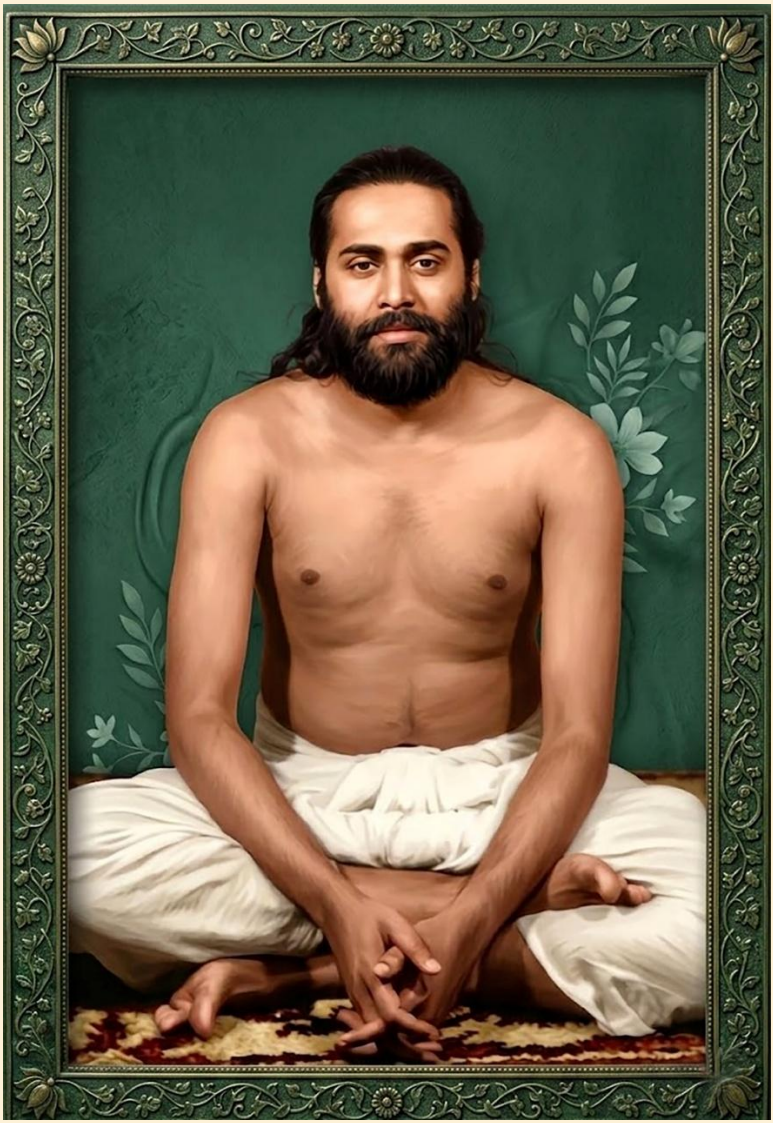

শ্রী প্রীতিকুমার

মানবজীবনের পরমতম লক্ষ্য পূর্ণতা অর্জন। সনাতন মানবধর্মের আকর গ্রন্থ "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়" প্রেয় লাভের যে পন্থা নিরূপিত হইয়াছে তত্ত্বদর্শী সাধকগণের মধ্যে যুগে যুগান্তরে তাহার ব্যাখ্যা লইয়া দ্বন্দ্ব ও মতদ্বৈধতা বিদ্যমান।

আচার্য শঙ্করের মায়াবাদী প্রতিভার প্রসাদে শ্রীমদ্ভগবদগীতা সর্বসাধারণ্যে পরিচিত হইয়া আসিয়াছে সংসার-ত্যাগীদের শাস্ত্ররূপে। কিন্তু বিবর্তিত চেতনার আলোকে আজ ইহা প্রতীয়মান - গীতা সন্ন্যাসীদিগের জন্য রচিত হয় নাই। সংসারাশ্রয়ী মানবের নিত্যদিনের পথচলার সঙ্কটমুহূর্তে যে দুরূহ জিজ্ঞাসা তাহার বিচারশক্তিকে বিভ্রান্ত করে, গতিময়তাকে প্রতিহত করে এবং অভিমুখকে পরিবর্তিত করে-সেই সকল প্রশ্নের চরম সমাধানের মাধ্যমে মানবের দিব্যজীবন লাভের উপায় গীতা। গীতায় অর্জুনের অহংবোধসঞ্জাত অবসাদ প্রণোদিত কর্মত্যাগের প্রচেষ্টাকে তামসিকতা ও ক্লৈব্য বলিয়া ধিকৃত করা হইয়াছে এবং এই বাহ্যসন্ন্যাস ও সংসার ত্যাগের প্রয়াসকে খণ্ডন করা হইয়াছে।

গীতার কর্মযোগ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভের জন্য প্রয়োজন সর্বাগ্রে Basic Concept বা মূলতত্ত্বানুগামীতার।

আচার্য শঙ্করাদি গীতার ভাষ্যকারদের মতানুসারে এই জগতের মূল ত্রিগুণাত্মিকা অবিদ্যা ও অজ্ঞানদায়িনী অপরা প্রকৃতি। ইহা ত্রিবিধ দুঃখের কারণ এবং সতত পুরুষার্থ বা নিঃশ্রেয়সের বন্ধনে প্রবৃত্তা। পুরুষ অপরিবর্তনীয় বিকারহীন নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টা মাত্র। কিন্তু অহংবোধে পুরুষ প্রকৃতির ক্রীড়ালীলায় আত্মপ্রক্ষেপ করিয়া দুঃখবেদনার অধিকারী হয়।

পুরুষার্থের তাৎপর্য প্রকৃতির নিম্নাকর্ষী বন্ধনকে ছিন্ন করিয়া আত্মচৈতন্যের উৎকর্ষতাসাধন। গীতার সাধনা এইরূপ ভেদবিচারের যাথার্থ্য প্রাথমিক স্তরে স্বীকার করিয়াও মহত্তর জ্ঞানের মহিমায় সম্প্রসারিত হইয়াছে। তাহার মতে সাংখ্য যোগে উক্ত এইরূপ মুক্তির অর্থ জীবনের লীলাময়তা হইতে বুদ্ধির প্রত্যাকর্ষণ করিয়া একান্ত নৈষ্কর্ম্যের শান্তিতে মগ্ন হওয়া। এই আত্মাভিমুখী কর্মহীনতা চরম সত্য হইলে প্রকৃতির সৃজনীস্পৃহা প্রতিহত হয়, সৃষ্টির দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু গীতা ঐ স্থিতিময় নিশ্চল পুরুষের অতীত এক সত্যের সন্ধান দিয়াছে - তিনি পুরুষোত্তম।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন-

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৭/৬

সর্বভূত এই প্রকৃতি হইতে জাত হইতেছে, আবার 'আমি' (পুরুষোত্তম)-ই সমগ্র জগতের উৎপত্তি ও বিলয়স্থল। তিনি ঘোষণা করিয়াছেন- "মত্তঃ পরতরংনান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়"। (৭।৭)। "আমি-ই শ্রেষ্ঠ সত্তা"। শাঙ্কর ব্যাখ্যায় যে নিষ্ক্রিয় নিশ্চল ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, সগুণ ব্রহ্মেরও উর্দ্ধে যাঁহার স্থান, তিনি গীতার **অক্ষর পুরুষ**, এবং ঐ সগুণ ব্রহ্ম গীতার **ক্ষর পুরুষ**। এই ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ **পুরুষোত্তম** সত্তার খণ্ডিত রূপমাত্র। তাঁহার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত অক্ষর পুরুষের শান্তিময় নির্লিপ্তি এবং বাহিরে ক্ষর পুরুষের কর্মময়তা। নিজের প্রকৃতির সহিত সংবদ্ধ হইয়া তিনি জগতের অনন্ত কর্ম অক্লান্তভাবে পালন করিতেছেন। বস্তুতঃ যে মায়াশক্তিকে শঙ্কর জগতের কারণরূপে নিরূপিত করিয়াছেন এবং "জড়স্বভাবা মিথ্যাভূতা সনাতনী" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন- তিনি এই পরা প্রকৃতি- পুরুষের সহিত অভিন্না- আদ্যাসৃজনী ও কর্ম শক্তি। বিশ্বপ্রপঞ্চ এই চিদ্-ময়ী শক্তির লীলাময় প্রকাশ। অপরা প্রকৃতি পরা

প্রকৃতি হইতেই উদ্ভুতা আলোকহীনা পরিণাম। এই কারণে জগৎ সত্য- ব্রহ্ম সত্যতর।

সেই পুরুষোত্তমে আপনাকে লীন করিতে হইলে অক্ষর পুরুষের নিষ্ক্রিয় প্রশান্তি আত্মস্থ করিয়া ক্ষর পুরুষের কর্মসাধনের অনুসরণ করিতে হইবে। ফলশ্রুতিতে মানবের অন্তর্প্রকৃতি হইবে অনাসক্ত এবং বর্হিপ্রকৃতি জগতে পুরুষোত্তমের কর্মসম্পাদনের যন্ত্র হইয়া উঠিবে। ফলাকাঙ্ক্ষাবিবর্জিত এই কর্মের স্বরূপই গীতার **"পূর্ণযোগ"**।

"শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার" বিবিধ অধ্যায়ে এই তত্ত্বই ক্রমাভিব্যক্ত।

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন ব্রহ্মে লীন হইবার পন্থা দ্বিবিধ- "জ্ঞানযোগেন কর্মযোগেন যোগীনাম্" হইলেও-

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতুতিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বং প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৩/৫

প্রকৃতিজাত গুণত্রয়ের অধীনে স্থূলদেহী মানব ক্ষণমাত্রও কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। তাহার জীবনধারণই প্রকৃতপক্ষে এক মহৎকর্ম।

কর্মের সংজ্ঞা লইয়া জ্ঞানবাদীগণেরও মধ্যে বিরোধ বর্তমান। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন-কাম্য কর্মত্যাগকে দ্রষ্টাগণ সন্ন্যাস বলিয়া থাকেন, জ্ঞানীগণ কর্ম-ফলে আসক্তিশূন্যতাকেই ত্যাগ বলিয়া থাকেন। (১৮।২)। নিয়তকর্মের পরিত্যাগ যুক্তিসম্মত নহে। মোহবশে এই ত্যাগ তামসিকতাকেই ব্যক্ত করিয়া থাকে। (১৮/৭)। বহুব্যক্তি "নিয়তং" কর্মের অর্থ বুঝিয়া থাকেন নিত্যকর্ম। কিন্তু গীতার

তাৎপর্য অনুসারে নিত্যকর্মের অর্থ নিয়ন্ত্রিত কর্মাবলী। এই নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয় শাস্ত্র, স্বভাব অথবা সেই পরমপুরুষ কর্তৃক।

যে ব্যক্তি অধ্যাত্মজীবনে প্রবেশলাভ করিয়াছেন তাঁহার সত্তার পূর্ণ বিকাশ সাধিত হইয়াছে। সতত আনন্দ-আপ্লুত নিরুদ্বিগ্ন নিত্যতৃপ্ত সেই পূর্ণমানবের আপনার জন্য আর কর্মের প্রয়োজন থাকিতে পারে না। তথাপি তাহার কর্মহীনতার অবকাশ থাকে না। সর্বভূতে অনাসক্ত এই মানবের কর্তব্য হইয়া উঠে পরম নির্লিপ্তির সহিত বৃহত্তর জগতের কল্যাণের নিমিত্ত কর্মযজ্ঞে প্রবৃত্ত হওয়া।

পরিণামবিমুখ এই মহত্তর কর্মচেতনার প্রবোধনই কর্মযোগের মূল তত্ত্ব। এই কর্মযোগের সাধনে যিনি নিবিষ্ট হন, স্ব-প্রকৃতির দিব্যরূপান্তর সাধন তাঁহাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে। (৩/১৭,১৮)

আপনাকে উদাহৃত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন – "ত্রিলোকমধ্যে আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছু নাই, অতএব করণীয়ও কিছু নাই; তথাপি আমি সতত কর্মে প্রবৃত্ত।" (৩/২২)

এই মহত্তর কর্মসাধনের তাৎপর্য নির্দেশ করিতে গিয়া গীতা বলিয়াছেন- সাধারণ লোক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরই আদর্শকে হৃদয়ে ধারণ করে এবং তাহার কর্মকে অনুসরণ করিয়া থাকে। (৩/২২).

অতএব শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কর্তব্য কর্মে আসক্ত অজ্ঞানদিগকে বাহ্যসন্ন্যাস গ্রহণে প্রবৃত্ত না করা। তিনি ঈশ্বরের সহিত সতত যোগযুক্ত থাকিয়া জাগতিক কর্মাদি পালনপূর্বক তাহাদিগকে কর্মে প্রবৃত্ত রাখিবেন। কারণ, যাহাদের প্রকৃতি কর্মাশ্রয়ী তাহাদিগকে কর্মত্যাগে অনুপ্রাণিত করিলে তাহাদিগের বুদ্ধিভেদ সম্ভাবিত হয়।

কর্মহীন এই লোকসকল কর্মযোগের তত্ত্ববিষয়ে অজ্ঞানতা হেতু জীবনসংগ্রাম হইতে পশ্চাদপসারণ করিলে তাহাদের প্রকৃতির বিকাশ রুদ্ধ হয়, নীতি ধর্ম সমাজ বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যদ্বারা কবলিত হয়।

কর্মানুষ্ঠান জীবের স্ব-ধর্ম অর্থাৎ স্ব-ভাব বা প্রকৃতি অনুযায়ী হওয়া প্রয়োজন। মূল প্রকৃতির স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতে হইলে সর্বাগ্রে কর্তব্য প্রকৃতির অবিদ্যার কারণ কাম-ক্রোধ ইত্যাদি অশুভ প্রেরণাসকলের বিনাশ-সাধন। সকল ইন্দ্রিয়ের স্ব-স্ব বিষয়ে আসক্তি ও অনীহা বর্তমান। ইহারা কল্যাণের মার্গে অন্তরায়। ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি কামের প্রভাবে জ্ঞানহীন। অতএব ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া বা প্রকৃতিস্থ নিম্নাভিমুখী আত্মশক্তিকে উর্দ্ধের শ্রেষ্ঠতর চিদ্‌শক্তির প্রভাবে শান্ত করিয়া কামকে বিনষ্ট করা সম্ভব।

অতঃপর যে গুণত্রয়ের প্রভাবে মানবের অহংবোধ তাহার আত্মচেতনাকে আবৃত করিয়া রাখে কর্মযোগের প্রভাবে উহা ক্রমে বিদূরিত হয়। অহং নয় প্রকৃতিই সর্ব কর্মের হোত্রী - অহংবিচ্যুত মানবের এই বোধই মানবের সকল কর্মকে ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদনে উদ্বোধিত করিয়া তাহাকে জ্ঞানযজ্ঞে প্রবৃত্ত করে। অসূয়াবর্জিত মানব পরমপুরুষের প্রতি সতত শ্রদ্ধাবান থাকিয়া কর্মবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে। (৩/৩১)। অন্তর্নিহিত দিব্যপ্রকৃতির বিকাশে দিব্যচেতনায় উত্তীর্ণ মানব ঈশ্বরের ন্যায় সকল অপূর্ণতার অতীত হইয়া বিশ্বলীলার আনন্দে নিষিক্ত হয়।

“জয়তু পার্থসারথি”!

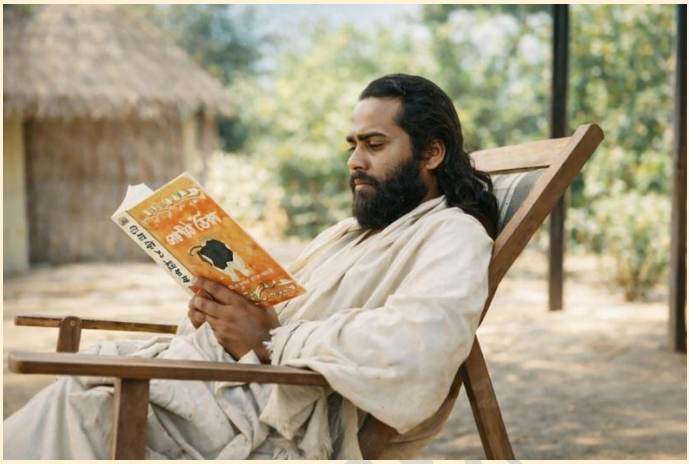

চক্রেশ্বর শ্রীপ্রীতিকুমার **সংকলন**

২০২৬ সালের ১০ই মার্চ ছিল পার্থসারথি পত্রিকার প্রাণপুরুষ শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষের জন্ম শতবার্ষিকী। ঐ মাসেই পার্থসারথির অন্তর্জাল প্রকাশনার ষষ্ঠ বর্ষ পূর্তি হল ৭২তম অন্তর্জাল সংখ্যার মাধ্যমে। ২৪শে মার্চে প্রকাশিত সংখ্যাতেই শ্রীপ্রীতিকুমার সম্পর্কে "শতবর্ষের দিনে" শীর্ষক একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।

গীতারত্ন শ্রীপ্রীতিকুমার ছিলেন একাধিক ধর্মীয়, সামাজিক ও সংস্কৃতিমূলক সংগঠনের কেন্দ্রবিন্দু। তিনি ছিলেন "পার্থসারথি চক্রের" প্রতিষ্ঠাতা, নির্দেশক, রূপকার; "পর্বতপ্রাণা" পর্বতারোহণ সংস্থার নিয়ামক; "পার্থসারথি প্রকাশন" সংস্থার কর্ণধার। তাঁর তিরোধানের চার দশক পরেও ১৯৬০ সালে প্রবর্তিত 'পার্থসারথি' মাসিক পত্রিকার প্রকাশ আজও অব্যাহত রয়েছে, তবে প্রকাশনার মাধ্যম পরিবর্তিত হয়েছে যুগের দাবীতে। যা' ছিল ছাপানো বই, তা'ই এখন ই-বুক!

"পার্থসারথি চক্রের" সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭০-এর দশকে সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদনগুলিতে। বিদগ্ধ ব্যক্তিরা তাঁদের আলোচনায় শ্রীপ্রীতিকুমার সম্বন্ধে যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছিলেন, বর্তমান প্রজন্মের অনুরাগীদের জ্ঞাতার্থে তাঁর কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। - (সম্পাদক)

প্রীতিবদ্ধ চক্রেশ্বর

আকর্ষণ করেন, তাই তাঁর নাম কৃষ্ণ। কৃষ্ণ নামেরও একটা আকর্ষণ আছে। নাম নিলে তাঁর আকর্ষণ হয়। তিনি আসেন। তিনি আসেন দেখতে পাই না, তাঁর আকর্ষণ হয় জানতে পারি না। আকর্ষণ যে শুরু হয়েছে জানতে পারি যখন ভক্ত সাড়া দেয়। ভক্ত আগে আসে। ভক্তের আহ্বানে তেমনি জানতে পারি যে নীল কিশোর কত ভালবাসে আমাদের। পার্থসারথির আহ্বানে গিয়েছিলাম ১৬ই আগষ্ট, ৭৬ পার্থসারথি চক্রে। গা ছম্ ছম্ করল। ঐ আকর্ষণটা যেন ঘরে ঢুকেই বুঝতে পারলাম। আরও বিস্মিত হলাম "চক্রেশ্বর"-কে দেখে। সাদা পোষাকে ধুতি পাঞ্জাবী পরা এক গুপ্ত যোগী। চোখ দেখলে বুঝতে ভুল হবার উপায় নেই এ সেই রামকৃষ্ণ কথিত চোখ। ডানা জুড়ে বসে পাখী চোখ মেলে ডিমে তা দিচ্ছে। এক মুহূর্তে আপন করে নিলেন। রাঙা মা বলেছিলেন এ সংসারটা লুকিয়ে থাকার পক্ষে অদ্ভুত জায়গা। তাই দেখলাম। আমরা সন্ন্যাসী। আগেই গৈরিক নিশান উড়িয়ে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি, "ওগো আমি সাধু!" এদের সে বালাই নেই। লোকে যখন গাড়ী চালানো শেখে তখন 'এল' লাগিয়ে রাখে গাড়ীতে। শেখা হয়ে গেলে 'এল' টেনে ফেলে দেয়। জানলাম এই মহান আত্মা শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ লাইসেন্স 'চাপরাশ' পেয়ে গেছেন। চক্র ত' তন্ত্রের কথা। সংঘের নামেই বুঝেছিলাম কোথায় তন্ত্রে আর গীতায় সন্ধি হয়ে গেছে। তাই তন্ত্রের ভাষায় বলি 'তুমি চক্রেশ্বর'।

'পার্থসারথির চরণে প্রার্থনা 'পার্থসারথি চক্র' তথা 'পার্থসারথি পত্রিকা উত্তর উত্তর সুন্দর থেকে সুন্দরতর হোক।

প্রীতিবদ্ধ স্বামী শিবানন্দ গিরি,
আনন্দ আশ্রম

কে এই প্রীতিকুমার?

গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং চণ্ডীতে দেবী চণ্ডী বলেছেন যে তাঁরা জীব-সংসারে সদা সঞ্চরনশীল জীবেদের অন্তরে ও বাইরে অবস্থান করছেন। অর্থাৎ তাঁদের শক্তিদ্বারা পরিচালিত হচ্ছে এই বিরাট ও বিস্ময়কর কর্মময় সংসারজগৎ। বাস্তবিক ঈশ্বরের শক্তিতে আমরা অর্থাৎ জীবজগতের প্রাণীরা সতত পরিচালিত হচ্ছি বা হচ্ছে। কথায় আছে, ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া গাছের একটা পাতাও নড়ে না। একথা ধ্রুব সত্য। কিন্তু আমরা সাধারণ মায়াবদ্ধ জীব এই কথার সত্যতা মেনে নিতে পারি না। আমরা সতত মায়ামোহে অন্ধ হয়ে পঞ্চেন্দ্রিয়ের দাসত্ব করে এই সংসারে বেঁচে আছি ও ঘোরাফেরা করছি। তার ফলে আমরা ভুলেও সেই সর্বশক্তিমান ও সর্বজীবের গতিনিয়ন্তা ঈশ্বরকে একবার স্মরণ করি না। আর করলেও তা করি অতি অল্প সময়ের জন্য এবং দায়সারা গোছের। এর দোহাই দিই কি জন্যে? না, আমরা নিত্য সাংসারিক কর্মে মেতে আছি বলে। অথচ এটা একবার তলিয়ে ভাবি না যে সংসারের আসল মালিক ও আদর্শ কর্ণধার হচ্ছেন তিনি, আমরা নই। তাঁকে ডাকলে বা স্মরণ করলে যত দ্রুত ও নির্বিঘ্নে সাংসারিক সমস্যার সমাধান হয় তা আমাদের মত ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও ছটাকি শক্তির অধিকারী

জীবেদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের এই অহং জ্ঞান আসে সীমাহীন অজ্ঞতা থেকে। কারণআমরা ঈশ্বরের অন্যতম শক্তি মায়ায় এমনি অভিভূত হয়ে আছি যে ঈশ্বরের আসলরূপ অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ আমরা প্রত্যক্ষ বা অনুভব করতে পারিনা। অথচ যোগী ও সাধকগণ ধ্যান, জপ ও তপস্যার প্রভাবে ঈশ্বরকে জানতে পারেন ও তাঁর অসাধারণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ লীলা উপলব্ধি করেন। এই যোগীরাই প্রকৃত সমাজ কল্যাণকারী এবং জনগণহিতৈষী। তাঁরা ঈশ্বরকে জেনে ও তাঁর শক্তির মাহাত্ম্য উপলব্ধি করে জীবকল্যাণের জন্য সতত উদগ্রীব হয়ে থাকেন। আমরা ঈশ্বরের কথা বললেও তাঁর লীলামাহাত্ম্য সহজে উপলব্ধি করতে পারি না। কিন্তু যোগীদের কাছে তা অনায়াস- লভ্য। তাই আমাদের জীবনপথে সঠিকভাবে চলতে হলে ও ঈশ্বরীয় শক্তির মাহাত্ম্য ও লীলার পরিচয় ও সান্নিধ্য পেতে হলে যোগীসঙ্গ একান্তই কাম্য। এই কারণে মহাযোগী প্রীতিকুমার ঘোষের সান্নিধ্য আমাদের একান্তই কাম্য বস্তু বলে আমি আন্তরিক ভাবে মনে করি এবং এও বুঝতে পারি যে তাঁর ছত্রছায়ায় আশ্রিত হয়ে আমরা এই মায়াবদ্ধ বিপদ-আপদ-সঙ্কুল সংসার-সাগরের অতল জলে তলিয়ে না গিয়ে সানন্দে ভেসে বেড়াচ্ছি।

- অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ

পার্থসারথি চক্রের অধিবেশনে

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রবচনের জন্য আমন্ত্রণলাভে বিশেষ প্রীত হয়েছিলাম। উক্তচক্রের নিয়ামক সাধক প্রীতিকুমার আমার দীর্ঘ কালের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ। ঐ অধিবেশনে উপস্থিত হয়ে তাঁর সাক্ষাৎ ও সান্নিধ্য লাভে আরও মুগ্ধ হই। বর্তমান যুগ অস্থিরতার যুগ। এই যুগে ভারতের সনাতন সাধনা ও শিক্ষাদর্শ প্রচারে যাঁরাই

ব্রতী রয়েছেন, তাঁরা সকলেই ভারতীয় জাতির অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। পার্থসারথি চক্র যে মহৎ সাধনায় ব্রতী তার ফলশ্রুতি সমগ্র মানব সমাজেরই কল্যাণপ্রদ। চক্রের সভ্য ও সদস্যগণ একটি আদর্শ পন্থা প্রদর্শন করছেন এই দুর্দিনে। এজন্য তাঁরাও অশেষ ধন্যবাদার্হ। শাস্ত্রীয় আলোচনা বা বিচারবিতর্কে জ্ঞানিগণ উপকৃত হন। কিন্তু যাঁরা নিজেদের জীবনে উচ্চাদর্শ পালন ও পোষণ করেন, তাঁরা সমগ্র সমাজেরই পথ-প্রদর্শক। সাধক প্রীতিকুমারের জীবনাদর্শ ও সাধনা আপামর সাধারণকে উচ্চভাবে উদ্দীপিত করে। বর্তমান সময়ে পথ-প্রদর্শক প্রকৃত আচার্যের অভাব দেখা যায়। আনন্দের বিষয় পার্থসারথি চক্রের সভ্য ও সদস্যগণ যোগ্য আচার্যের শিক্ষা-দীক্ষার অধিকারী। এর ফলে, কেবল তাঁরা নিজেরাই নন তাঁদের সংস্পর্শে যাঁরাই , এসেছেন, আসছেন এবং ভবিষ্যতে আসবেন - সবাই ধন্য। আমি বিশ্বাস করি পার্থসারথি চক্র নিজ মহিমায় এবং শক্তিতে সুদীর্ঘকাল ধরে সমাজের আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধন করবে। আমি আরও বিশ্বাস করি এই চক্র মহাবাহু অর্জুনের সুহৃদ-গুরু স্বয়ং ভগবান পার্থসারথিরই চক্র। জয়তু পার্থসারথি চক্র।

- স্বামী দেবানন্দ সরস্বতী
মহামণ্ডলেশ্বর। ২৪/০৮/৭৮

‘CHAKRA’ in the eyes of a Swami’

I had the rare privilege to come in contact, though for a very short time, with a serene-looking and in-drawn personality like Sri Priti Kumar Ghosh under whose able spiritual guidance, the Partha Sarathi Chakra has completed its glorious tenure of

little over two years. Shri Ghosh's deep insight has rightly chosen this unique name for the organisation for it is that wheel of causation or the 'Kal Chakra' which has been rolling incessantly, crushing everything on its way and the very name therefore infuses into a spiritual aspirant the intense urge to liberate himself from the shackles of births and deaths.

I sang the Sarada-Ramkrishna Leela Geeti at one of the meetings organised by the 'Chakra'. The presence of Sri Priti Kumar Ghosh inspired me to put forth my best and the function created a sublime and serene environment.

The 'Chakra' is still in an infant stage. But in course of time shall, in all probabilities, blossom forth into a real selfless-service organisation motivated by God everywhere consciousness. I wish the 'Chakra' every success in its noble mission of service to humanity.

Siva-Nah-Santu Panthanah.

– Swami Chandrasekhorananda
Secretary. Ramkrishna Sarada Sevashram
P.O. Dharampura, Dist. Bastar (M.P.)

A TRIBUTE

I have known Sri Priti Kumar Ghosh for some time and watched with considerable interest and admiration his varied efforts to create a consciousness in society for the ethical and religious values of India that have been cherished through centuries. His profound learning and direct and indirect contacts with the spiritual masters of the country enable him to undertake such an arduous task easily. The sittings of Parthasarathi Chakra and the journal of Parthasarathi through which he seeks to fulfil his mission have been, I am sure, illuminating not for me only.

As a social person, too, it is not easy to find his match. What add to his individual attractions for his modesty, humanity and his unassuming and persuasive manners.

------ Dr. B. Mukherjee, M.B.B.S. (Hons.)
D.S C, F.N.I.
Ex-President, Asiatic Society of Bengal

My Assessment

It is very rarely that one comes across man like Sri Priti Kumar Ghosh. As I had the privilege of coming into close contact with him .... my assessment of his personality is not likely to be seriously disputed what, in the first place, overwhelmed me is his amazing range of spiritual knowledge and the profound thinking. This has given him a deep insight into human nature and its weaknesses. But what is really ennobling about the whole thing is that he does not view these weaknesses with contempt. On the contrary, it is with genuine sympathy and realism that he treats them.

This does mere mean that he connives at these foibles. But it is with sympathy and subtle moral appeal that he seeks to remove them without hurting the sentiments of those who seek his help. I can speak with some authority in this matter as I had myself to approach him with such a purpose. His healing touch - not many are endowed with this virtue - immediately removed by agony and restored the peace of my mind. What is more, the contact with him has completely changed my outlook of life. His appeal is confined mainly to the moral and spiritual plane without

being very conspicuous. And this is what makes his personality so alluring and magnetic.

Sri Bibhuti Bhushan Dutta
Asst. Editor-in-charge
Amrita Bazar Patrika

A TRIBUTE

To come across a man who accepts all the responsibilities of life and no less importantly all the commitments of modernity while carrying on a most difficult social mission and ceaselessly searching for spiritual enlightenment - all apparently without any special effort, is a rare experience. It is my good fortune that I met such a man like Sri Priti Kumar Ghosh for whom my respect and regards increased immensely as I came to know him closely. He goes through enormous troubles to improve social health and illumine individual awareness in his own benign way. Sri Ghosh is one of those who restore confidence and trust in human attitude and endeavour.

- Sri Biswajit Roy
Asst. Editor, Amrita Bazar Patrika

Address by the President of "Partha Sarathi-Chakra"

He who helps him in this search for the soul is the real preceptor who has to be held in esteem, even when he is not the saint or sadhu one expects him to be. Let him be a full-fledged householder - it does not matter in the least. To quote Sri Ramkrishna's words - Has he or has he not got the chaprash or the authority to dictate i.e. the right conduct, the right contemplation, the right way of life which makes him not only a path finder but a teacher to others, bringing them the solace they are definitely in need of. Parthasarathi Chakra and its founder director serve this purpose. Status stratification, social stratification and a sense of nobility are not enough to bring in a quiet revolution in a man's personality unless they come with a definite spiritual significance and reveals to one, the inner significance of his being. Such a mission was established under the active guidance and advice of a holy preceptor, Sri Priti Kumar Ghosh, a dedicated soul who has been the prime architect of this "Band of Hope". He is not an initiated Puri, Ananda, Giri or Swami, but he has acquired it though a house-holder, by his plain living and high thinking. As Sri Aurobindo says - We have to offer all our gains and works to the powers of higher existence

and for this the liberating word must be found, the illuminating hymn must be framed. Sj. Priti Kumar Ghosh is a Gita-Ratna, in the true sense of the term which means that he is so versed in that lore and in its tenets - the triple transformation through Karma, Jnana and Bhakti - that he shines as a jewel in the exposition of its philosophy, which in essence is non-attached existentialism.....

- Dr. Sudhanshu Mohan Banerjee
M.A., L.L.B., Ph. D.,
I.A. & A.S. (Retd) Accountant General

"পার্থসারথি চক্রে"র মাননীয় সম্পাদকের প্রতিবেদন

আমি পার্থসারথি চক্রের পক্ষ থেকে আজ আপনাদের সকলকে সাদর সম্ভাষণ জানাই-আমাদের চক্রের তৃতীয় বার্ষিকী অধিবেশনে। আপনারা সকলেই জানেন যে এই চক্র ১৯৭৪ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের ১৯৬১ সালের ১৬নং আইনের বিধি অনুসারে নথিভুক্ত করা হয়। পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী-শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ মহাশয় এক উচ্চ আদর্শ নিয়ে এই চক্র প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরই কৃপায় ও অনুগ্রহে আমরা আজ চতুর্থ বর্ষে উত্তীর্ণ হতে চলেছি। -------

আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা ভাল কিছু একটা কাজ দেখাতে পারব যেটা আমাদের চক্রের সকল সদস্যদের গর্বের বিষয় হবে। অবশ্য সেজন্য চাই লোকবল, অর্থবল ও আমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

আমরা ভাগ্যবান যে পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রীতিকুমারের মত মহান সাধক-পুরুষের সান্নিধ্যে এসেছি এবং তাঁরই হাতে গড়া পার্থসারথি চক্রের সেবার সুযোগ পেয়েছি। তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করে আমাদের কর্মে তার পরিচয় বহন করব এবং চক্রের উদ্দেশ্য ও আদর্শকে সার্থক করে তুলব।

আমাদের চক্র ভগবান শ্রীপার্থসারথির নাম স্মরণ করে পার্থসারথির পতাকা বহন করে এগিয়ে চলেছে। আমাদের জীবনে শ্রীশ্রীভগবানের বাণী, গীতার মর্মবাণী - জগতের বিভিন্ন ধর্মের প্রবর্তক ও অবতার পুরুষদের জীবনকথা ও ধর্মমত প্রচার করে যাচ্ছে চক্রের অধিবেশনে ও পার্থসারথি পত্রিকার মাধ্যমে।

যাঁর প্রেরণায়, যাঁর উদ্দীপনায়, যাঁর শিক্ষায়, যাঁর নির্দেশে ও যাঁর আশীর্বাদে এই পার্থসারথি চক্র মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে তার নির্দিষ্ট পথে সেই দিব্য পুরুষ ও দিব্য কর্মী শ্রীপ্রীতিকুমার যিনি আমাদের সারথী ও পথনির্দেশক তাঁকে আমাদের ভক্তি নম্র চিত্তের সশ্রদ্ধ প্রণাম। তাঁর নির্দিষ্ট পথে আমরা যেন আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। আমাদের যাত্রা যেন সাফল্য মণ্ডিত করতে পারি - ভগবান পার্থসারথির কাছে এই প্রার্থনা। --------

চক্রের প্রতিটি অধিবেশন আমাদের আত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য হয় সে কথা যেন আমরা না ভুলি। সংসারের সমাজের ও দেশের কাজে যথা সম্ভব নিঃস্বার্থভাবে সেবা করবার ও শিক্ষা লাভ করার যে সুযোগ আমরা পেয়েছি তার জন্য আমরা পার্থসারথি চক্রের ও পার্থসারথি চক্রের প্রতিষ্ঠাতার কাছে ঋণী। আমাদের সকলেরই মহাসৌভাগ্য যে আমরা এই চক্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে প্রকৃত পক্ষে আমাদের নিজেদের কল্যাণ সাধন করছি।

শ্রীপ্রীতিকুমারের কাছ থেকে নানা আলোচনার মাধ্যমে আমরা আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করি। তিনিই আমাদের সকল কর্মের উৎস। --------

করুণাময় ভগবান পার্থসারথির কৃপায় ও মহান সাধক শ্রীপ্রীতিকুমারের কৃপায় ও সক্রিয় সাহায্য এবং চক্রের পরমহিতৈষী বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী, সদস্য ও ভক্তগণের নানা প্রকার সাহায্য এই চক্রের পরিচালনা ও কার্যকলাপকে সম্ভবপর করে তুলেছে। এঁদের সকলকে জানাই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিবাদন। যে সকল জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি পার্থসারথি চক্রের অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করেছেন ও যোগদান করেছেন এবং তাঁদের সমবেত চেষ্টায় প্রতিটি অধিবেশন সাফল্য মণ্ডিত করেছেন তাঁদের সকলকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। শ্রীপ্রীতিকুমার আমাদের আশীর্বাদ করুন যেন আমরা সকলে পার্থসারথি চক্রকে নির্দিষ্ট পথে চালিত করতে পারি ও এর উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে পারি।

শ্রী নীরেন মৈত্র
সাধারণ সম্পাদক

-শ্রীপ্রীতিকুমার-
আমাদের বন্ধু ও পথ নির্দেশক

মানুষ মাত্রেই সমান - কথাটার মানে কী? এটা ঠিক যে জীব বিজ্ঞানের দিক থেকে মানুষ একটি স্তন্যপায়ী প্রাণী, কাজেই প্রাণী হিসাবে সব মানুষের ঐক্য আছে। আবার অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের দিক থেকে- 'জীবঃ ব্রহ্মৈব না পরঃ' - এই সিদ্ধান্ত অনুসারে মানুষ মাত্রেই ব্রহ্ম, কাজেই সমান, এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সংসারে রোজ

কি মানুষের এই সমতা বা ঐক্য আমাদের চোখে পড়ে? বরঞ্চ -অর্থ-সম্পদ, শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিক মান মর্যাদা, সর্বদিকেই উৎকট অসাম্য - শুধু এ যুগে ও ধনতান্ত্রিক দেশে নয়, সেকালেও ছিল এবং এখনো আছে সর্বত্র, এমন কি সমাজ তান্ত্রিক দেশেও। শিক্ষা বিস্তার, আইন প্রণয়ন, সাংস্কৃতিক ও রক্তাক্ত বিপ্লব - এসব দিয়ে এই অসাম্য দূর করা যায়নি, যাচ্ছে না, যাবেও না। কেন? কারণ মানুষের প্রতিটি জীব কণার এ জন্মে স্বয়ম্ভূ-আবির্ভাব হয় নি। এ জন্ম পূর্ব পূর্ব জন্মের চক্রে - পূর্ব কর্ম সূত্রের ফলে। এটি ভারতীয় শাস্ত্রের মূল কথা। যে পর্যন্ত কর্মফল ভোগ শেষ না হবে বা নিষ্কাম কর্ম সিদ্ধি না হবে, শুধু প্রারব্ধ নয়, সঞ্চিত কর্মের নাশ না হবে, সে পর্যন্ত মুক্তি বা ব্রহ্মলীনতা অসম্ভব। জাগতিক সাম্য ও ঐক্য বলে যে আবেগ সমৃদ্ধ জড়বাদের কথা - তা দিয়ে জীবন ব্যাখ্যা করা যায় না। কাজেই বাস্তব জগতে অনৈক্য আছে ও থাকবে। মানুষের কাম্য এই স্বচিত্র অনৈক্যের মধ্যে ঐক্যের অনুভব করা।

অনৈক্যের প্রসঙ্গে পাশাপাশি দৃষ্টান্ত দেখুন। আমরা প্রীতিকুমারকে দেখি, তাঁর সঙ্গে বসে চা খাই, গল্পগুজব করি। দেহগত সাম্য নিশ্চয় আছে - তবু কি সর্বতোভাবে ঐক্য আছে সকলের সঙ্গে প্রীতিকুমারের? গীতায় ভগবান দশম অধ্যায়ে বিভূতি যোগ সম্বন্ধে যে কথাটি (৪১) বলেছেন তা স্মরণ করুন।

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবম ॥

যেখানে আছে সৌন্দর্য, শক্তি - সেখানেই ভগবানের তেজ। জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই ভগবৎ তেজ থাকলেও - তার পরম প্রকাশ আধ্যাত্মিকতায়, শক্তির পরাকাষ্ঠা।

আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন যথার্থ সাধক দুর্লভ। যাঁরাও আছেন তাঁদের মধ্যে অনেকে নিজের সাধনা নিয়ে মগ্ন থাকতে চান বলে আত্মগোপন করেন, আবার কেউ

কেউ আছেন সমাজস্তরের এতো উর্দ্ধে যে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের বিচরণ সাধারণ লোকের নাগালের বাইরে। আমাদের মতো হয়ে একই ভূমিতলে দিব্য শক্তি নিয়ে বিচরণ করেন, গভীর আন্তরিকতা ও প্রেমে সুখ দুঃখের সাথী হন, জীবনের সর্বস্তরে সাহায্যের অভয় হস্ত প্রসারিত করেন এমন লোক - বিরল সাধক দেখেছেন? আমরা একজনকে খুব কাছে পেয়েছি - যাঁর নাম শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ। পার্থসারথি চক্রের মধ্যবর্তী পুরুষ ও পার্থ সারথি মাসিকের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। ব্যক্তিগত ভাবে ত্রিশ বৎসরাধিক কাল তার সঙ্গে পরিচয় আমার। পরিচিতির অতি সান্নিধ্যে মানুষের মধ্যে গুণ গ্রাহিতা থেকে দোষ গ্রাহিতার সঞ্চয় বেশি হয় বলে যে ইংরাজী প্রবাদটি (Familiarity breeds contempt) চালু আছে তা কিন্তু সংসারে একেবারেই অলীক নয়। মানুষ মাত্রই দোষদর্শী। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আমি সুদীর্ঘ কালের মধ্যে এই গৃহী সন্ন্যাসীর জীবনে এমন কিছু খুঁজে পাইনি যা আমাকে বিন্দুমাত্রও তিক্ত বা বিমুখ করে বা সমালোচনার সুযোগ দেয়। বন্ধু বাৎসল্যে, গভীর আন্তরিকতায়, আশ্রিত জন প্রীতিতে বিচিত্রস্তরের মানুষের কাছে তিনি পরম ভরসা ও আশ্রয়স্থল। নিজের সাধনাকে নিজের মধ্যে গচ্ছিত না রেখে প্রিয়জনের সেবায় অকাতরে বিতরণ করে যাচ্ছেন তিনি। স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাসীর যে মূল মন্ত্র বলেছিলেন – "আত্মনঃমুক্তয়ে জগদ্ধিতায়"- তার প্রথমটির কথা তিনি জানেন - কিন্তু দ্বিতীয়টির - জগতের কল্যাণের পাত্রের বা ভাজনের সংখ্যা এখন অনেক, আরও অনেক হবে। লোক কল্যাণের এই নদীধারা- অফুরন্ত হোক।

- ডঃ শ্রী হরিপদ চক্রবর্তী
অবসরপ্রাপ্ত বিদ্যাসাগর অধ্যাপক,
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়,
ও কলা বিভাগের ডিন অফ ফ্যাকাল্টি

নিজের কথা লেখবার সময় মনে হয় আমার আবার কথা কি? সারা জীবন তো পাড়াপড়শী নিয়ে ঘর করলাম, ফলে নিজের ভাই, ভাজ, দেওর, ননদ কবেই যেন দূরে সরে গেছে। তাকালে আর দেখতে পাই না। ছেলে বিয়ে করেছে, সংসারী হয়েছে - সন্তান হয়েছে - নিজের একটা unit করে ফেলেছে। আমাকে কেউ অসম্মান করে, একথা বলব না। শ্রীপ্রীতিকুমারের আমলে সারা দিনের কাজের লোক দু একটা থাকতো - আমাকে খাবার serve করা, চা করে দেওয়া, এসব করতেই হয়নি। তাই ঐ অভ্যাসটা আমার একেবারেই নেই। কেউ আসবে বা খাবে জানলে আমি সব কাজ খুব তাড়াতাড়ি সেরে ফেলি গল্প করব বলে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই লোকে মনে করবে আমি এ বাড়ীতে কোনও কাজ করি না। আসলে আমরা

ছোটবেলা থেকেই খুব সোচ্চার। যা করব বলে কয়ে, হৈ হৈ করে। তাই অভিনয়টা একেবারেই পারি না। আজ জীবনের সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে একটা কথা বলতে পারি - জীবনে অভিনয় শেখবার প্রয়োজন আছে। না হলে ভাগ্যের হাতে মার খেতে হয়। যারা এই অভিনয় করে সংসারে সুনাম কুড়োয় আমি তাদের নমস্কার করি।
সহিষ্ণু আমি কোনদিনও নই। বরং গত সাত বছরে আমি আমার সন্তানকে সমস্ত বিপদ কাটিয়ে ওঠবার জন্য মাথা পেতে দিয়েছি। মাঝে মধ্যে বিরোধ হয়নি তা নয়। কিন্তু এখন মনে হয় আমার আরেকটু সতর্ক হওয়া দরকার ছিল।

আমি সেই মা নই যে ছেলে Engineer বলে তাকে টাটা বিড়লার সমকক্ষ মনে করব। ভদ্রলোকের ছেলে, ভালোভাবে পড়াশুনা করাবার চেষ্টা করেছি, Guide করেছি। Jt. Entrance পরীক্ষা দিয়ে Engineering পড়েছে। না পারলে শিক্ষকতা করত। কোনও Profession-ই তো ফেলবার নয়। পড়াশুনায় আমিও তো পিছিয়ে থাকিনি। ছেলেকে M.E. পড়বার সুযোগ দিয়েছি। সে complete করেনি। এ দুঃখ আমার জীবনেও যাবে না। একটি মাত্র সন্তানকে highly qualified করতে চেয়েছিলাম, হয়নি।

এ বাড়ীতে শ্রীপ্রীতিকুমার এখনও বেশ তোয়াজে আছেন। নিত্য নূতন বাসনে খাবার খাচ্ছেন। নিত্য নূতন বিছানা বদল করছেন - একটি ঘর সম্পূর্ণ দখল করে রেখেছেন। ফুলে ফলে ধূপে একাকার। আমার হাসিমুখ দেখবার জন্য তিনি খুব সচেষ্ট ছিলেন। আর সেটাতো আমার অহঙ্কারই। আমিও তো সংসারকে ফাঁকি দিইনি। কর্তব্য বা করণীয় যা তার থেকে একটু বেশীই করেছি। আমার শাশুড়ী আমার পুত্রের বৌভাতের দিনে পিঠে হাত রেখে বলেছিলেন, "তোমার মত নিষ্ঠা ও

ত্যাগ কজনের থাকে মা?" এই আদর্শ, সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে করতে আমি কবেই যেন হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম। তার উপর উপরি ছিল বিভিন্ন পরিবারের সাথে হৃদ্যতা। নিজে কারো বাড়ী বেশী যেতেন না। সবাই তাঁর কাছে আসতো। সেখানেও আদর্শের ছড়াছড়ি। আমি আর আত্মপ্রেমিক হতে পারলাম না। হয়ে গেলাম বিশ্বপ্রেমিক। ফল যা হবার তাই হোল। পুত্রকে আঁকড়ে ধরলাম। সব ব্যাপারে তার প্রাধান্য। বন্ধু হয়ে গেল। নিজের ব্যক্তিত্ব বোধহয় ওখানেই খুইয়ে বসলাম। অনেক আলোচনা ও পরামর্শ তার সাথে করেছি যেটা করা উচিত হয়নি। মা হিসাবে তাই উত্তরণ হয়নি। সমকক্ষ হিসেবে অবতরণ হয়েছে।

পুত্র প্রথম শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণীতে ওঠা পর্যন্ত কখনও ক্লাসে দ্বিতীয় হয়নি। সাপ্তাহিক, অর্দ্ধ বাৎসরিক, বাৎসরিক সব পরীক্ষাতে সে প্রথম হোত। তার জন্য কখনই গর্ব করে কাউকে কিছু বলিনি। মনে হোত একটু পড়লে ওরকম Result করা কঠিন নয়। সে হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দিত, তখন আমরা ফুটপাত বসে থাকতাম। আজ বোধ হয় সে সব কথা তারও মনে সেই। আর থাকলেও সেটা সে পাওনা হিসেবেই নেবে। আর সেটাই তো স্বাভাবিক।

আমি ১৯৬৬র পর Mountaineering-এ উৎসাহী হলাম। সে সময়ে খবরের কাগজে খুব লেখালেখি হয়েছিল আমাকে নিয়ে। নীরেনদা ওঁরা খুব আনন্দ বোধ করতেন আমার কৃতিত্বে। ছেলে, ভাইপো, ভাইঝি, পাড়ার ছেলেমেয়ে সবাইকে পর্বতারোহণে উৎসাহ দিতাম। অনেক সময়ে ছেলেমেয়েরা টাকা পয়সা দিতে পারত না। আমি নিজে কতজনকে টাকা দিয়ে দিয়েছি। এখন তাদের মধ্যে অনেকেই বড় বড় Mountaineer হয়েছে।

পুত্তর এবার গাড়োয়ালে ট্রেকিংয়ে যাচ্ছেন। তার গোছগাছ চলছে গত একমাস ধরে। আমি দেখতে পাই বিরাট প্রস্তুতি চলছে, আলমারী খোলা হচ্ছে, জিনিষ বেরোচ্ছে। পরিকল্পনা চলছে। কেউ বলতে পারেন অত জানবার কি দরকার! দরকার আর কিছু নয়। শুধু একটু কৌতূহল। পরম মমতায় যা সঞ্চয় করেছি সেটা নাড়াচাড়া করতে বা ব্যবহার করতে দেখতে কার না ভালো লাগে বিশেষ করে আমি যখন আর পাহাড়ে যেতে পারব না। কিন্তু আমি এখন চরম উদাসীনতার অভিনয়টুকু করতে শিখেছি। ত্যাগ করে সব ছেড়ে যাবার মানসিকতা আর নেই, যে কদিন বাঁচতে হবে সংগ্রাম করেই বাঁচবো। শিবের মত বুক পেতে দিতে আমার পতি দেবতা পেরেছিলেন, তাই তাঁকে একটু তাড়াতাড়ি চলে যেতে হয়েছে। আমি একটু দেরী করেই যাব এবং যতটা পারব ততটা দেখেই যাব।

আমি চাকরী করছি ১৯৫৭ সাল থেকে। কারও কাছে হাত পাতবার আমার দরকার হয়নি নিজের জন্য। অনেকেই আমাকে ভালোবাসেন, সাহায্য করেন। সুশিক্ষা দেবার চেষ্টা করেন। বিশেষ করে শ্রীপ্রীতিকুমার প্রয়াত হবার পর যে shelter আমি পেয়েছি কারও কারও কাছ থেকে, আমরণ আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থেকে যাব। আমার পুত্তরের অফিসের অনেক কাজ বেড়ে গেছে। এখন ছুটি থাকলেও তার বেরোতে ইচ্ছে করে না। কারও খবর নেবার সময়ও তার কমে গেছে। আমি সব দেখি। অবস্থাটাকে মেনে নেবার চেষ্টা করি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি –"ভগবান ওকে স্বাবলম্বী কর ও যেন নিজের দায় নিজে নিতে পারে। আমার জীবনে যেন ও বন্ধন না হয়ে ওঠে। আমি থাকতে ও স্বাধীনভাবে থাকতে পারবে না। বিয়ে করেছে। বৌ-এরও তো মনের মত করে সংসার করতে ইচ্ছে করে। সে ব্যবস্থাটা তাড়াতাড়ি করে দাও" - এ প্রার্থনা আমি সতত করি। মানুষের ঘাড়ে

যতক্ষণ দায়িত্ব না পড়ে ততক্ষণ সে নিজের সামর্থ সম্বন্ধে সচেতন হয় না। স্বাধীনভাবে থাক। আমি দেখতেও যাবো না। অনেকে বলেন, "বাচেন্দ্রীকে ছেড়ে থাকবে কি করে?" তাদেরও বোঝা দরকার বাচেন্দ্রী তার মা বাবার কাছে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। আমি তো জুনকোকে দশদিন থেকে কাছে কাছে রেখেছিলাম। জুনকো হবার পর NCC camp-এ যাওয়াও বন্ধ করে দিয়েছিলাম আমি। সেই জুনকো কোথায় গেল? সে কি আমার কাছে আছে? গত সাত বছরে সে কি একবারও আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে? আমিও কি আর তার নাম উচ্চারণ করি? মানুষের সব সয়ে যায়। সময়ের সাথে সাথে সবই সইয়ে নিতে হয়। আমিও সেই চেষ্টাই করব। আমার উপস্থিতি কারও দীর্ঘ নিঃশ্বাসের কারণ হবে এটা আমিও চাই না। দিন তো ২৪ ঘণ্টায় ফুরিয়ে যায়। সেই দিনগুলি ঐ সতর্ক ভাবে চলতে গিয়ে নষ্ট করি কেন ?.....

শ্রীপ্রীতিকুমার মহাপুরুষ ছিলেন, তিনি সব দুঃখ ব্যথা সইতে পারতেন। আমি অতি সাধারণ মহিলা। আমার তো মান অপমান ভাব ভালবাসা প্রকাশ পাবেই।

(** রচনাকাল – অক্টোবর, ১৯৯৩)

(আলোকচিত্র- সপরিবারে শ্রীপ্রীতিকুমার শ্যামবাজারের পুরনো বাড়িতে, সম্ভবত ১৯৫৮ সালে)

স্মৃতি পথে শ্রী প্রীতিকুমার

‘পর্বতপ্রাণা’ আয়োজিত ‘রুবালকাং’ অভিযানের প্রাক্কালে দলনেতা সুনন্দনকে ক্লাবের ও দেশের পতাকা তুলে দিয়েছিলেন শ্রী প্রীতিকুমার (১৯৮৬)

শ্রী প্রীতিকুমার তাঁর মা, স্ত্রী ও সন্তানের সাথে

"সাধুজী" নামটা মনে এলেই কেন জানি না একটা 'সৌম্য', 'সুন্দর', 'দীপ্তিময়' এক ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির কথা মনে হয়। আজ তাঁর জন্মের ১০০ বছর অতিক্রান্ত হলো- ভাবলেই কেমন যেন শিহরণ জাগে। সত্যিই সময় কি দ্রুত লয়ে চলে!

আমাদের চার ভাই বোনের জীবনে সাধুজীর দান অনস্বীকার্য। জীবনের প্রতি পদে পদে আমরা তাঁর উপস্থিতি উপলব্ধি করেছি – বলা যায় এখনও করে চলেছি।

আমরা যখন প্রথম শ্যামবাজারের বাড়ীতে আসি, সেই থেকেই সাধুজীকে দেখার বা জানার সৌভাগ্য আমাদের সবার হয়েছিল। একতলার ঐ ছোট ঠাকুরঘরটা ছিল আমাদের কাছে এক বিস্ময়। ছোট বেলায় আমরা অত বুঝতাম না, কিন্তু যত বড় হয়েছি - ততোই ঐ ঘরের মাহাত্ম্য আমাদের কাছে প্রকট হয়েছে। কি সুন্দর ঘরটি - কতো ঠাকুরের মূর্তি দিয়ে সাজানো। মা কালীর অপরূপ সাজ, আবার তাঁর পাশেই শ্রীমা ও ঋষি অরবিন্দর ছবি।

আমাদের কাছে এ ঘরটি ছিল ঠাকুর ঘর cum সাধুজীর ঘর।

আমাদের সবচেয়ে মজা হতো কালীপুজোর সময়। সাধুজীর কালীপুজো বলে কথা - কি আনন্দ, কতো জনসমাগম হতো কালীপুজোর সন্ধ্যেবেলা। নীচের ঘরের দালানে সারা সন্ধ্যে থেকে রাত অবধি নামসংকীর্তন হতো। আর ছোট ঠাকুর ঘরটা ফলমূল, মিষ্টি ও নানাবিধ উপাচারে পরিপূর্ণ থাকতো। সাধুজী সারা রাত ধরে কালীপূজা করতেন। আর সকালে যখন ঠাকুর ঘর থেকে বেরোতেন - তখন তাঁর কি দিব্যসুন্দর রূপ! আহা! এখনও মনের মধ্যে ছবিটা যেন গেঁথে আছে। আমরা সবাই প্রণাম করতাম এই ঈশ্বরপ্রতিম ব্যক্তিত্বকে। আর সাধুজীও প্রাণভরে আমাদের আর্শীবাদ করতেন। ঐ আর্শীবাদটুকুই আমাদের সারা বছরের পাথেয় হয়ে থাকতো।

আমার মাও সাধুজীকে গুরুর ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন। মাঝে মাঝে মা নিজে রান্না করে সাধুজীকে খাওয়াতেন। আমরা সব ভাই বোনেরা সাধুজীকে ঘিরে বসে থাকতাম। ওনার খাওয়া না হলে একদম গাত্রোত্থান করতাম না। সাধুজীও সেই সময় আমাদের সাথে কত্তো গল্প করতেন! হাসি, মজা, কৌতুক যে কত্তো হতো - সে আর বলার নয়।

আমাদের সব ভাই বোনদের মধ্যে সাধুজী আমার দাদাকে খুব ভালোবাসতেন। দাদাও সাধুজীর দুর্বার আকর্ষণে মোহিত হয়ে থাকতো।

আমার কাছে সাধুজী ছিলেন - Friend,. Philosopher & Guide. যখনই কিছু ছোটখাটো সমস্যা হতো- সাধুজীকে না বললে আমার চলতো না। সাধুজী ও হাসিমুখে আমার সমস্যার সমাধান করে দিতেন। সাধুজীর একটা কথা আমার এখনও মনে পড়ে – "চুচু (আমার ডাক নাম), মনকে সমুদ্রের মতো বিশাল করবে, মনে কোনও কালিমা রাখবে না। তবেই মনে শান্তি পাবে।"

সাধুজীর স্ত্রী, আমাদের কাকীমা (শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ) খুব প্রাণখোলা মানুষ ছিলেন। পেশায় অধ্যাপিকা হলেও তিনি ছিলেন অতি অমায়িক ও প্রবল ব্যক্তিত্বময়ী। আমরা সবাই ওনাকেও খুব পছন্দ করতাম। আমার মায়ের সাথেও কাকীমার একটা বিশেষ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল।

সাধুজী খুব অল্পবয়সে চলে গেছিলেন। শেষের দিকে আর শ্যামবাজারে বেশী আসতে পারতেন না। কারণ হাই সুগার তাঁর দৃষ্টিশক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। আমরা তখন খুবই অভাব বোধ করতাম সাধুজীর।

তারপর একদিন হঠাৎ শুনলাম – সাধুজী আর আমাদের মধ্যে নেই। এখন খুব আফশোস হয় শেষ সময়ে ওনার পাশে না থাকার জন্য।

যাইহোক, সাধুজী নেই, কিন্তু সাধুজীর ছেলে বাবু তথা সুনন্দন ঘোষ সাধুজীর কাজ 'পার্থসারথি'-র সম্পাদনা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে করে চলেছে। বাবু পেশায় Civil Engineer এবং অতি অমায়িক এক ভদ্রলোক।

সাধুজীর এক তলার 'ঠাকুর ঘর' এখনও ঠিক সেইভাবেই আছে। এখনও আমরা ঘরটিকে সাধুজীর ঘর হিসাবেই দেখি। বাবু মাঝে মাঝে এসে ঠাকুরদের সাজিয়ে যায়। পুজো করে। এখনও কালীপুজো সেই ভাবেই হয় – ঘরভর্তি ফলমূল ও নানা উপাচারে পরিপূর্ণ। অর্থাৎ এস ওয়াজেদ আলির কথায় - সেই tradition এখনও চলেছে। শুধু 'সাধুজী' নেই - কিন্তু তাঁর 'আর্শীবাদ'টুকু আমাদের সবার জন্য পিছনে ফেলে গেছেন - এটাই আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা।

শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ - আমার চিনিমামা

শ্রী পার্থ কুণ্ডু

আমার ছোটবেলা বিহারের নানান জায়গায় কেটেছে। সেইসময় কলকাতায় এলে মায়ের সঙ্গে শ্যামবাজারে আমরা চিনিমামার সঙ্গে দেখা করতে আসতাম। উনি গম্ভীরভাবে গোঁফে হাত দিয়ে মুচকি হাসতেন আর আমি একটু ভয়ে-ভয়েই চুপ-চাপ বসে থাকতাম। শ্যামবাজারে শীতের বিকেলে পাশের চায়ের দোকান থেকে এলাচ দেওয়া দুধ চা আনতে যাওয়াটা বেশ মনে আছে। তারপরে কালীপুজোর পরের দিন খুব ভোরে এসে প্রণাম করে মামার হাত থেকে প্রসাদ নেওয়া একটা নিয়মের মত ছিল। আমরা পাকাপাকিভাবে কলকাতায় আসবার পরে, একবার সল্টলেকের বাড়িতে উনি এসেছিলেন। আরো অনেকে ছিলেন - একটা উৎসব ও আনন্দের পরিবেশ তৈরী হয়েছিল। বরানগর, নাগেরবাজারেও প্রণাম করতে যাওয়া হতো। একবার মনে আছে, শ্যামবাজার এ গিয়েছি। মনটা একটু খারাপ ছিল, কারণ বাবার ডাক্তার বন্ধু আমার মুখে ছুরি কাঁচি চালিয়ে দাঁতের পাথর বার করবেন বলেছেন, যার জন্য একটি বন্ধুর বাড়ির নেমন্তন্ন খাওয়াও হবে না। মামা জিজ্ঞেস করেছিলেন বোধহয় - মুখ গোমড়া কেন আমার। তারপর ফিরে আসবার সময় একবার হাত দিয়ে ব্যথার জায়গাটা স্পর্শ করেছিলেন। পরের দিন মুখ ধোবার সময় মটর দানার মতো পাথর বাবাজি এমনই বেরিয়ে এল । মামার আশীর্বাদে কোনো কাটাকাটি করতে হল না। আমিও নাচতে-নাচতে বিকেলে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলাম।

স্কুল থেকে কলেজ - চাকরি - গার্হস্থ্য জীবন আর এখন চাকরি থেকে প্রায় অবসর নেওয়ার সময় - এই লম্বা সফরে সবসময় অনুভব করেছি যে আমি চিনিমামার কৃপাধন্য। ছোট- ছোট মুহূর্ত, ঘটনা - বলে হয়তো বোঝান মুশকিল, কিন্তু আমি অনুধাবন করেছি যে মামা আমাদের সাথেই আছেন, পাশেই আছেন। তবে তার বকা কি জিনিষ, সেই অভিজ্ঞতা আছে বলেই চলতে চেষ্টা করি সঠিক রাস্তায়।

"সকালবেলা চেয়ে দেখি, দাঁড়িয়ে আছো তুমি একি, ঘর-ভরা মোর শূন্যতারই বুকের 'পরে ...।"

জীবনে যখনই চরম বিপর্যয় নেমে এসেছে, যখনই মনে হয়েছে জীবনের সমস্ত কিছু শেষ হয়ে গেল, ঠিক তারপরেই আমি উপলব্ধি করেছি যে সেই যুদ্ধগুলোতে আমি একা ছিলাম না। আমার নিবিড়তম অন্ধকার দিনগুলোয়, আমি অনুভব করেছি তাঁর দৃঢ় উপস্থিতি। বুঝতে পেরেছি যে জীবনের প্রতিটি কঠিন মুহূর্তে, তিনি আমার সঙ্গী হয়েছিলেন। তিনি শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ, আমার দাদুমণি।

১৯৮৬ সালে যখন দাদুমণি চলে যান, তখন আমার বয়স মাত্র ২ বছর এবং আমার ভাই তখনও জন্মায়নি। কিন্তু ছোট থেকেই আমরা, দিয়া, দাদু, বাবা, মায়ের কাছে দাদুমণির কথা, গল্প, নানা ঘটনা শুনে বড় হয়েছি। দাদুমণির কথা শুনতাম আর তাঁর অপূর্ব ছবিগুলো দেখতাম, যেখানে তিনি স্মিত হেসে তাকিয়ে আছেন। সেইখান থেকেই দাদুমণির এক প্রতিচ্ছবি আমার মনে গড়ে উঠেছিল। ধীরে ধীরে শ্রদ্ধা ও ভক্তি জন্ম নেয়। আর যখন আরও বড় হলাম... তখন জন্ম নিল ভালোবাসা।

আমি আর আমার ভাই দাদুমণিকে সেইভাবে দেখতে না পেলেও, ঠাম্মা, কাকুমণি আর কাকীমণির অপার স্নেহ পেয়েছি। ঠাম্মার বিরাট মনের ভালোবাসা, মাঝে মাঝে কড়া বকুনি, কাকুমণির effective guidance আর কাকীমণির মমতাভরা স্নেহ আমাদের জীবনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। ঠাম্মা আমাকে ভালোবেসে নাম দিয়েছিলেন শ্রীমন্তী এবং আমাকে শ্রীমন্তী বলেই ডাকতেন। আমি তাঁদের কাছে সমর্পিতা নয়, শ্রীমন্তী হয়েই থেকে যেতে চাই। আমার নিশ্চিতভাবে মনে হয় যে তাঁদের এই গভীর ভালোবাসার ভেতর দিয়ে আমি আর আমার ভাই দাদুমণির ছোঁয়া কিছুটা পেয়েছি এবং পেয়ে চলেছি।

আমি আগেই বলেছি যে ছোট থেকেই আমরা দাদুমণির কথা আর অনেক গল্প / ঘটনা শুনে বড় হয়েছি। তার মধ্যে দাদুর বলা একটা ঘটনা আমার মনে বিশেষ ভাবে দাগ কাটে। দাদু সেই সময়ে কোনো কারণে খুব মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলেন। একদিন খুবই অস্থির চিত্তে উনি শ্যামবাজারে যান দাদুমণির সাথে দেখা করতে। কিন্তু শ্যামবাজারে পৌঁছে দেখেন যে দাদুমণি ততক্ষণে বেরিয়ে গেছেন। দাদু খুবই অসহায় বোধ করতে শুরু করেন। মন যেন আরও হতাশায় ভরে গেল। যাইহোক, তখন উনি বন্ধ দরজার বাইরে থেকেই মা কালীকে মনের সমস্ত কথা জানান ... সব কিছু উজাড় করে দেন মায়ের কাছে। প্রার্থনা করেন মানসিক শান্তির জন্য। প্রার্থনা শেষ হলে, পেছনে ফিরেই দেখেন দাদুমণি দাঁড়িয়ে। দাদু তখন হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "দাদা আপনি?" তখন দাদুমণি বলেন যে তিনি শ্যামবাজার থেকে বাসে করে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিয়েছিলেন। হঠাৎ তিনি বুঝতে পারলেন যে দাদু উদ্ভ্রান্ত অবস্থায় শ্যামবাজারে এসে পৌঁছেছেন। তিনি তখন সঙ্গে সঙ্গে বাস থেকে নেমে আবার শ্যামবাজারের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন।

দাদু স্তম্ভিত হয়ে দাদুমণির দিকে তাকিয়ে থাকেন। এত ভালোবাসা? তিনি ভাষা হারিয়ে ফেলেন। দাদু প্রায়ই বলতেন যে দাদুমণির কাছে যে স্নেহ ভালোবাসা তিনি পেয়েছেন, সেটা তাঁর বাবা-মার থেকেও পাননি। এই ঘটনাটা আমাকেও গভীর ভাবে নাড়া দেয়। ভক্ত যখন ভগবানের জন্য ব্যাকুল হয় তখন ভগবানও ভক্তের জন্য ব্যাকুল হয়ে তার কাছে ছুটে আসেন। এই ঘটনাটা শোনার পর আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে দাদুমণি আমার মনের খুব কাছে চলে এসেছেন। তিনি যেন আমাদের একান্ত আপনজন!

একটা কথা ছোট থেকেই আমার পরিবারের কাছ থেকে শুনে এসেছি, যে দাদুমণির কৃপাতে তাঁরা আমাকে পেয়েছেন এবং আমাকে তাঁর কাছে সমর্পণ করা হয়েছে। অর্থাৎ আমার জীবনের সমস্ত কিছু তিনি দেখছেন, আমাকে তিনি দেখছেন। সেই জন্যই আমার নাম রাখা হয় সমর্পিতা। বাবা, মা সবসময় বলতেন, "যখনই কোনো বিপদে পড়বে, কোনো দ্বিধা বা সংশয়ের সম্মুখীন হবে, দাদুমণিকে সব খুলে বলবে। তিনি তোমাকে পথ দেখাবেন।" ছোটবেলায় সব কথা অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করতাম। কিন্তু যত বড় হয়েছি, ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে গিয়েছি, মনে বহুবার প্রশ্ন জেগেছে, "দাদুমণি কি সত্যি আমাকে দেখছেন? তাহলে এত বিপর্যয় কেন? এত চরম সংঘর্ষ কেন?" এই পরিপ্রেক্ষিতে একটা ঘটনা বলি, সেই ঘটনা আমার জীবনের একটা Turning Point বলা যেতে পারে।

আমার জীবনে ৫-টা বছর, ২০০৩ থেকে ২০০৮, একটা অত্যন্ত কঠিন অধ্যায়। আমার জীবন যেন একটা standstill পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। সবকিছু যেন থেমে আছে .... আমি কোনোভাবে এগোতে পারছিনা। হতাশা আর বিফলতা ঘিরে ফেলেছে চারিদিক। এর থেকে যেন কোনো পরিত্রাণ নেই।

এটা 2007-এর জুন মাসের ঘটনা। আমি, মা, বাবা আর আমার ভাই চেন্নাই বেড়াতে গিয়েছি। আমি বেড়াতে গেলেও ভেতরে ভেতরে খুবই অস্থির ... মন সবসময় ভারাক্রান্ত। একদিন রাতে আমি বাথরুমে ঢুকে খুব কাঁদলাম... আর বারবার ভগবানকে অন্তর থেকে আর্তি জানালাম আমাকে উদ্ধার করার জন্য। সেইদিনই ভোর রাতে আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি। আমি দেখি যে দাদুমণি বসে আছেন আর আমি তাঁর পায়ের সামনে বসে কাঁদছি। দাদুমণি আমার দিকে তাকিয়ে দৃঢ় ভাবে বললেন, "তুমি কেন এত ভাবছ? আমাকে ভাবতে দাও।"

আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি বাকরুদ্ধ! এত স্পষ্ট স্বপ্ন আমি খুব কম দেখেছি। তাঁর কথাগুলো তখনও যেন পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলাম – "আমাকে ভাবতে দাও।" ঠিক বোঝাতে পারবনা তখন আমার কেমন লাগছিল। আমি তো Specifically দাদুমণিকে ডাকিনি। আমি ভগবানকে ডেকেছিলাম আমাকে উদ্ধার করার জন্য। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম আমি তাঁকে না ডাকলেও, আমার সব কষ্টগুলো তাঁর জানা, তাই তো তিনি আমার কাছে এসে এত বড় একটা আশ্বাসবাণী দিয়ে গেলেন। এমন এক আশ্বাসবাণী - যেটা আামার জীবনটা বদলে দিল। আমি উপলব্ধি করলাম যে বাবা, মা যেটা বলতেন সেটা পুরোপুরি সত্যি। দাদুমণি সত্যি আমার জীবন দেখছেন, আমাকে দেখছেন। আমি তাঁরই! আমার প্রতি বিফলতায়, বিপদে, কষ্টে তিনি আমার সাথে আছেন, এবং থাকবেন। আমি ধীরে ধীরে নিজের ওপর হারানো বিশ্বাস ফিরে ফেলাম। জীবনের অনেক জট খুলতে শুরু করল। পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করল। আমি আবার-এগিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে পেলাম।

সবার মনে ভগবানের একটা ছবি থাকে। আমি সবসময় ভগবানকে অহৈতুকী কৃপা ও ভালোবাসার source ভেবে এসেছি। আমি ওনার দিকে না

এগোলেও, উনি নিজে আমার দিকে এগিয়ে আসবেন। হয়ত অনেকের মধ্যে আমি দাঁড়িয়ে আছি। উনি ঠিক আমাকে লক্ষ্য করে ওনার কাছে ডাকবেন। হঠাৎ একদিন আমি আবার আর একটা স্বপ্ন দেখলাম ... এবারও খুবই স্পষ্ট। আমি দেখলাম যে আমি কোনো বাড়িতে lift দিয়ে উঠছি। Lift টা একটা floor-এ এসে দাঁড়ালো। আমি দেখলাম, lift এর ওপারে দাদুমণি দাঁড়িয়ে। অপূর্ব তার মুখমণ্ডল। উনি আমার দিকে তাকিয়ে, স্মিত হেসে বললেন, "এসো..."। তারপর ওনার সাথে করে আমাকে নিয়ে গেলেন। তাঁর মুখ নিঃসৃত "এসো" শব্দটার মধ্যে যে কি আন্তরিকতা আর ভালোবাসা ছিল সেটা আমি বোঝাতে পারব না। সেই অনুভূতি ভোলার নয়। আমার কাছে তিনি নিজে এসে, আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। এই অহৈতুকী কৃপা, এই অহৈতুকী ভালোবাসাই তো আমি খুঁজছিলাম!

দাদুমণিকে আরও কাছ থেকে জানার ব্যাপারে "প্রীতিময় শ্রীপ্রীতিকুমার" বইটির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক ছোটবেলা থেকেই এই বইটিকে আমি বারবার পড়েছি এবং এখনও পড়ি, দাদুমণিকে আরও ভালোভাবে জানতে, তাঁকে হৃদয়ের অন্তরে অনুভব করতে আবার অনেক সময় তাঁর guidance পেতে। বহুবার বহু বিপদ, বহু দুবিধাতে পড়ে আমি বইটি খুলেছি .. এই আশায় যে হয়ত আমার সমস্যা সংক্রান্ত দাদুমণির কোনো বাণী বা কোনো কথা বা কোনো ঘটনা খুঁজে পাবো এবং অদ্ভুত ভাবে প্রায় প্রতিবারই তা আমি খুঁজে পেয়েছি ... আশ্বস্ত হয়েছি। এরকম অগুন্তিবার হয়েছে যে মনে কোনো ভীষণ আশঙ্কা নিয়ে বইটি খুলেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখ পড়েছে – "ভয় কি? আমি তো আছি।" - এই শব্দগুলোয়। তারপর মনে আবার জোর পেয়েছি, কখনও কৃতজ্ঞতায় কেঁদে ফেলেছি।

মনে আছে ২০১৪ সালে আমার বিয়ের সময়ে আমার পরিবার এক অত্যন্ত কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল এবং সেটা বেশ কিছু বছর ধরেই চলছিল। একেকটা দিন, একেকটা যুদ্ধের মত। এখন সেই দিনগুলোর কথা যখন ভাবি মনে হয় যে আমরা তখন যে বেঁচে থেকেছি সেটা দাদুমণির কৃপা ছাড়া সম্ভব ছিল না।

যাইহোক, আমার বিয়ের তারিখ ঠিক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কিভাবে বিয়ের সব বন্দোবস্ত করব, কি করে বিয়ের এত সব কিছু আয়োজন করব, সব ব্যবস্থা কি করে হবে ... আদৌ বিয়েটা ঠিকঠাক ভাবে সম্পন্ন হবে কিনা ... এই সব নিয়ে প্রচণ্ড উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছিলাম। একদিন ভীষণ অস্থির চিত্তে আমি আবার দাদুমণির কাছে আশ্রয় নিলাম। "প্রীতিময় শ্রীপ্রীতিকুমার" বইটা আবার খুললাম এবং যেই line-টার ওপর চোখ পড়ল সেটা হল, "হবে, সব হবে।" মনে পরম অভয় লাভ করলাম। বুঝতে পারলাম যে তিনি পাশে আছেন। সব ঠিক ভাবে হয়ে যাবে। এবং সত্যি প্রচুর বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও, বিয়েটা ভালো ভাবে মিটে গেল।

আরও একটা ঘটনার কথা বলি। তখন ২০২২ সালের মে মাস। আমার মেয়ে প্রায় দশদিন ধরে জ্বরে ভুগছে। ওষুধ খেয়েও কিছুতেই জ্বর কমছে না। মাঝে মাঝে temperature কমছে ... তারপর আবার দ্বিগুণ বাড়ছে। আমি শেষে একদিন পুরোপুরি অসহায় হয়ে দাদুমণিকে ডাকতে শুরু করি। তাঁর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর কাছে আকুল ভাবে প্রার্থনা করি যাতে মেয়ে সুস্থ হয়ে ওঠে। প্রার্থনা করতে করতেই হঠাৎ যেন একটু আশ্বস্ত বোধ করলাম। মনে হল তিনি শুনছেন। প্রার্থনা শেষ হতে, মেয়ের কপালে হাত রেখে খুব অবাক হলাম! জ্বর অনেকটা কম। সেইদিন রাতেই মেয়ের সেই দশদিনের ধুম জ্বর সেরে গেল।

দাদুমণির সান্নিধ্য আমি সেভাবে পাইনি কিন্তু তাঁকে অনুভবে আমি পেয়েছি। কোনো না কোনো ভাবে ঠিক তাঁর ছোঁয়া আমার কাছে পৌঁছেছে। তাঁর উপস্থিতি আর তাঁর অহৈতুকী ভালোবাসা আমি অন্তরে উপলব্ধি করেছি।

জীবনের পথে চলতে চলতে অনেক সময়ে হয়ত তাঁর প্রতি অভিমান হয়েছে, রাগ হয়েছে, সংশয় এসেছে। এরকমও হয়েছে যে বহুদিন তাঁকে আমি ভুলে থেকেছি কিন্তু ভুলে গেলেও তিনি কখনও আমাকে ভোলেননি। আমি অনেকবার দূরে চলে গেছি কিন্তু তিনি আমার হাত কোনোদিনও ছাড়েননি। আমার না বলা প্রার্থনা তিনি শুনেছেন, আমি না ডাকতেও কাছে এসেছেন। আমার অজস্র অপরাধ, পাপ, গ্লানি নিয়ে তাঁর কাছেই আমি ফিরে ফিরে এসেছি এবং আমি এটা অনুভব করেছি যে আমার সমস্ত কিছু নিয়েই তিনি আমাকে গ্রহণ করেছেন। আমাকে বারবার উদ্ধার করেছেন, পথ দেখিয়েছেন।

রজনীকান্ত সেনের "আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে" গানটা আমার অত্যন্ত প্রিয়। এই গানের কিছু পংক্তি শুনে দাদুমণির কথাই বারবার আমার মনে হয়েছে, এবং সেই গুলি দিয়েই আমার লেখা শেষ করব।

"এই চির অপরাধী পাতকীর বোঝা হাসি মুখে তুমি বয়েছ
আমার নিজ হাতে গড়া বিপদের মাঝে বুকে করে
আমায় বুকে করে নিয়ে রয়েছ,
আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে তুমি অভাগারে চেয়েছ।"

সংস্কৃতে ‘গু’ মানে অন্ধকার আর ‘রু’ মানে ব্যক্তি বিশেষ যিনি সেই অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসেন বা আলোতে যাওয়ার পথ বলে দেন। বলে দেন এ মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি! বুঝিয়ে দেন বিবেক ও বৈরাগ্যের অর্থ।

আমরা যখন এই সংসারে মানব দেহ ধারন করে আসি, তখন আমাদের প্রথম গুরু/শিক্ষক আমাদের ‘মা’। মা আমাদের এই জীবন সম্বন্ধে অবগত করান।

আমরা যখন কিছুটা বড় হই, তখন আমাদের বাবাকে পাই আমাদের গুরু/শিক্ষক হিসাবে। জীবনের পথে কি ভাবে অগ্রসর হতে হবে তা' তিনি বলে দেন- কখনও স্পষ্ট করে সোজা ভাষায়, কখনও দৃষ্টান্তের মাধ্যমে, কখনও গল্পের ছলে।

আমরা স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাই আমাদের গুরু হিসাবে। তাঁরা আমাদের বিভিন্ন বিষয় বুঝতে সাহায্য করেন, পরীক্ষায় যাতে সফল ভাবে উত্তীর্ণ হতে পারি সেই উদ্দেশ্যে।

কলেজ/ ইউনিভারসিটির গণ্ডি পেরিয়ে আসার পর আমরা অনেকেই দিশাহীন হয়ে পড়ি। আমরা অনেকেই একটি পথ ঠিক করে পাড়ি দিই - গন্তব্য না জেনে। হয়ে যাই ‘ছকে বন্দী ময়ূর’। বিবাহ-সংসার-পুত্র-কন্যা ইত্যদি। সদগুরুর নির্দেশ ও উপদেশ না পেয়েই জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। গুরুর প্রয়োজন মানব জীবনের সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য। মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ বা আত্ম-উপলব্ধি। আত্মজ্ঞানের জন্য যে গুরুর প্রয়োজন তাঁকে আমরা চয়ন করতে

পারিনা - স্কুল কলেজের শিক্ষকদের মতন। সদ্‌গুরু আমাদের কাছে ডেকে নেন, কাছে টেনে নেন যদি আমরা ঈশ্বর লাভে আগ্রহী হই।

ভারতীয় শাস্ত্রে গুরুকে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মাঝামাঝি অবস্থিত সেতু বলা হয়ে থাকে। কথামৃতে পাই শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ একদল ভক্তকে বলছেন গুরুকে ঈশ্বর-রূপে জ্ঞান করতে হয় ও তাঁর কথায় বিশ্বাস করতে হয়।

যীশু দু' প্রকারের দ্বার ও রাস্তার কথা বলেছেন। প্রথমটি প্রশস্ত দ্বার, চওড়া ও আলোকিত রাস্তা, যার শেষে সর্বনাশ অপেক্ষা করে আছে। দ্বিতীয়টি সংকীর্ণ দ্বার, যার পথ দুর্গম, যার শেষে অপেক্ষা করে আছে জীবন বা মুক্তি।

যে সমস্ত মানুষ গুরুর দেখা পাননা তারা সাধারণত প্রথম দ্বার দিয়েই প্রবেশ করে। কিন্তু যারা গুরুর কৃপাধন্য, তারা গুরুর নির্দেশে দ্বিতীয় দ্বারটি-তে প্রবেশ করে এবং অনন্ত জীবন লাভ করে।

এই দীর্ঘ ভূমিকাটি অনেকটা ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়ার মত। আসলে যখন সোজা কথাগুলো সোজা ভাষায় প্রকাশের পথ খুঁজে পায় না, তখন তত্ত্বের জটিলতা জন্ম নেয়।

শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ আমার গুরু, আমার পথপ্রদর্শক, আজও। তাঁর কাছে আমি যা শিখেছি, তা' আমার নিজস্ব সম্পদ। আপন পরিসরের বাইরে সে নিয়ে আলোচনার অধিকার নেই। কিন্তু এখানে সকলের জ্ঞাতার্থে কিছু তথ্য নিবেদন করছি।

শ্রী প্রীতিকুমার আমার বাল্যবন্ধু সুনন্দনের পিতৃদেব। আমরা বন্ধুরা তাঁকে মেসোমশাই বলেই ডাকতাম। আমরা যখন নীচু ক্লাসে পড়তাম তখন মাঝে মাঝে

দেখতাম সুনন্দনকে ওর বাবার সঙ্গে সাইকেল রিক্সা করে স্কুলে আসতে। ওকে স্কুলের গেটে নামিয়ে দিয়ে উনি চলে যেতেন সিঁথির মোড়ের দিকে। একদিন দেখলাম মেসোমশাইও রিক্সা থেকে নামলেন ও সুনন্দনের হাতে একটা নোট দিয়ে আবার রিক্সায় উঠে চলে গেলেন। আমি সেদিন ভেবেছিলাম সুনন্দনরা নিশ্চয়ই খুব ধনী। কারণ, আমি কখনই চার আনার (পঁচিশ পয়সার) বেশী পেতাম না ঠাকুমার কাছ থেকে। মেসোমশাই ছিলেন অন্য বাবাদের থেকে একটু অন্য রকম। দীর্ঘকায় চেহারা, লম্বা চুল মাথার পেছনে খোঁপা করে বাঁধা, মুখে লম্বা দাড়ি। সর্বদা ধুতি পাঞ্জাবী পরতেন।

সুনন্দনের হাতে একটা বালা ছিল পাঞ্জাবীদের মত। ওর বাবার ঐ রকম চেহারা। আমি একদিন আমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম – ঘোষেরা কি পাঞ্জাবী হয়?

বয়স যখন আর একটু বাড়ল তখন সকালবেলা হরিণঘাটার ডিপো থেকে দুধ নিয়ে আসার দায়িত্ব পড়ল আমার কাঁধে। সেখানে সুনন্দন ও দিব্যজ্যোতির সঙ্গে প্রায়শঃই দেখা হত। সখ্যতা ও বন্ধুত্ব বাড়লো। দুধ নেওয়ার পরে মাঝে মাঝে আমরা গল্প করতাম নানা রকমের ও নানা ধরনের। দেরী হওয়ার জন্য বকুনি খাবো এই কথা মাথায় আসতেই ছুটতাম যার যার বাড়ীর দিকে।

একবার স্কুলের ছুটির সময় দাদু আমাকে বললেন তাঁর সাথে বাজারে যেতে ও সাহায্য করতে। এই ভাবেই নাকি বাজার কি করে করতে হয় অর্থাৎ জিনিস কি ভাবে বাছতে হয়, দর-দাম করতে হয় তা শেখা হয়ে যায়। বাজারের থলি হাতে দাদুর সঙ্গে বাজার করতে গিয়ে মেসোমশাইয়ের সঙ্গে কখনো কখনো

দেখা হয়ে যেতো। তখনও উনি আমাকে চিনতেন না। মেসোমশাই সাইকেলে চড়ে বাজারে আসতেন। সাইকেল রাখতেন "সমবায়িকা" বলে একটা দোকানের পাশে। পরে যখন একলা বাজারে গেছি তখন বাজারের গেটে ঢোকার আগে সমবায়িকার সামনে গিয়ে দেখতাম মেসোমশাইয়ের সাইকেল রাখা আছে কিনা অর্থাৎ উনি বাজারে এসেছেন কিনা। ওনাকে দেখার একটা প্রবল বাসনা মনের গভীরে সবসময় থাকত।

এরপর যখন সাইকেল নিয়ে বড়রাস্তায় যাওয়ার অনুমতি পেলাম, তখন সুযোগ পেলেই সাধারণতঃ ছুটির দিনে সুনন্দনদের বাড়ী যেতাম। তখনই মেসোমশাইয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়। কিন্তু কথা বেশী কখনই হোত না। কখনও উনি জিজ্ঞাসা করতেন সাইকেলটা লক করেছি কিনা। কখনও বলতেন সাইকেল বাড়ীর সামনে রাস্তায় না রেখে পাশের গলিতে রাখতে।

একদিনের কথা খুব মনে পড়ে। মেসোমশাই স্নান করে এসে সামনের ঘরে খাটের উপর বসলেন। আমরা তখন কলেজে পড়ি। কারুরই যাতে পড়ার ক্ষতি না হয় সে জন্য একটা বই সঙ্গে রাখতাম, আমি মাটিতে বসে আলমারিতে ঠেসান দিয়ে পড়ছিলাম। উনি খাটের উপর বসতে মুগ্ধ হয়ে ওনাকে দেখতে থাকলাম। যিশুর ছবি যেমন দেখি ঠিক সেই রকম! কিছুক্ষণ পরে উনি পার্থসারথির প্রুফ রিড করতে শুরু করলেন। কোথা থেকে সোমা ঘরে এলো। ও তখন বেশ ছোট। মেসোমশাই সোমাকে স্ক্রিপ্ট পড়তে বললেন। আমি ভাবলাম আমাকে না বলে উনি ছোট্ট সোমাকে কেন বললেন! কিছু পরে আমাকে পড়তে বললেন। তখন তো জানতাম না যে উনি অন্তর্যামী। আমি কিন্তু ভালো ভাবে পড়তে পারলাম না। তখন মেসোমশাই বললেন - ঠিক আছে আমিই নিজেই দেখে নিচ্ছি।

মাঝে মাঝে মাসীমা সুনন্দনকে বলতেন মেসোমশাইকে জিজ্ঞেস করতে যে উনি আজ শ্যামবাজারে যাবেন কিনা। আমার খুব অবাক লাগতো। আমি ভাবতাম শ্যামবাজারে ওনার অফিস। আমার বাবা তো রোজ অফিস যান, তবে উনি কেন ইচ্ছামত যাবেন? রহস্যটা অনেক পরে বুঝতে পেরেছিলাম।

আর একটা জিনিস খুব মোহিত করতো – ওনার সিগারেট খাওয়া। ক্যাপস্টান সিগারেট পান করতেন কৌটো থেকে একের পর একটা। আর কাউকে কৌটোর সিগারেট খেতে দেখিনি। সালটা খুব সম্ভব ১৯৮৩। একটা বিশেষ কারণে উনি সিগারেট খাওয়া বন্ধ করে দিলেন। এমনই ছিল ওনার মনের শক্তি।

আমাদের আর একজন সহপাঠীও তাঁর বাবা মা পরিবার নিয়ে মেসোমশাইয়ের কাছে আসতো। আমরা সুনন্দনের বন্ধু ছিলাম, কিন্তু মেসোমশাইয়ের অপ্রতিহত আধ্যাত্মিক আকর্ষণে কিভাবে যেন আমি মেসোমশাইয়ের ভক্ত হয়ে উঠেছিলাম। সুনন্দনদের বাড়িতে আরো অনেক বন্ধুর নিয়মিত যাতায়াত ছিল। কিন্তু হয়তো মেসোমশাইয়ের প্রবল ব্যক্তিত্বের জন্য কেউ কেউ তাঁর কাছে স্বচ্ছন্দ বোধ করত না। একজন তো বলে ফেলেছিল, মেসোমশাই মনের কথা বুঝতে পারেন। আমার তো মনের মধ্যে কত সময় কত আজেবাজে চিন্তা ঘুরপাক খায়। তাই ওনার সামনে যাই না।

মেসোমশাই চলে যাওয়ার কিছুদিন আগে ওনাদের বারাসতের বাড়িতে কেয়ারটেকারের সমস্যা হওয়ায় আমি আর সুনন্দন মাঝে মাঝেই বারাসতের বাড়িতে থেকেছি। ওনার হঠাৎ তিরোধানের পরে আমারও ব্যক্তিগত জীবনে অনেক পরিবর্তন আসে। কলকাতা থেকে অনেক দূরে কালিম্পঙে চাকরী নিয়ে চলে যেতে হয়।

তারপর থেকে ওখানেই সংসার, গ্রাহামস' হোমের প্রিন্সিপাল পদ থেকে অবসর গ্রহণ।

এখনও কলকাতায় এলে সুযোগ পেলেই মেসোমশাইয়ের ঘরে গিয়ে বসি। অনেক কথা। অনেক স্মৃতি।

পার্থসারথি পাই নিয়মিত। যে মাসে প্রীতিকণা থাকে না, সেই মাসে কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

সুনন্দনের তাগাদায় খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমার মত একজন সাধারণ মানুষ একজন অসাধারণ ব্যক্তির কিছু কথা লিপিবদ্ধ করলাম। এ আমার গুরু প্রণাম।

বরাহনগরে

স্বামী শিবানন্দ গিরির সাথে

‘বাবা’কে

সুনন্দন ঘোষ

হঠাৎ চলে গেলে।
প্রথম প্রথম একটা করে বছর কাটতো,
ভাবতাম তোমার কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছি।
কবে যেন ঘড়ির কাঁটা ঘুরতে শুরু করলো উল্টোদিকে।
এখন একটা করে বছর যায়,
বুঝতে পারি একটু একটু করে তোমার কাছে পৌঁছচ্ছি।

জ্ঞানশান্ত ভিক্ষুর মত সমাধিস্থ হয়ে অর্হত্বের প্রতীক্ষা করার
সাধন নেই আমার।
শ্যামবাজারে তোমার পনেরো বাই দশের ঘর,
অমরপল্লীতে তোমার সাত বাই পাঁচের খাট,
আর প্রতিমাসের পার্থসারথি -
এই নিয়ে এখন আমার পৃথিবী।

যে পথ ধরে এতদিন হেঁটেছি,
ফেলে আসা সে পথ হারিয়ে যাচ্ছে কুয়াশায়,
আবছা হয়ে যাচ্ছে পুরোনো সঙ্গীরা।
আবার অন্ধকার ছিঁড়ে হাত বাড়াচ্ছে
নতুন প্রজন্ম!
শৈশব থেকে বার্ধক্য --- অবিরাম পথ চলা ---
যতদিন তোমার আঙিনায় না পৌঁছই,
চলুক এই পাওয়া হারানোর খেলা!

অঙ্কন – প্রচেতা ঘোষ